WBMDFC

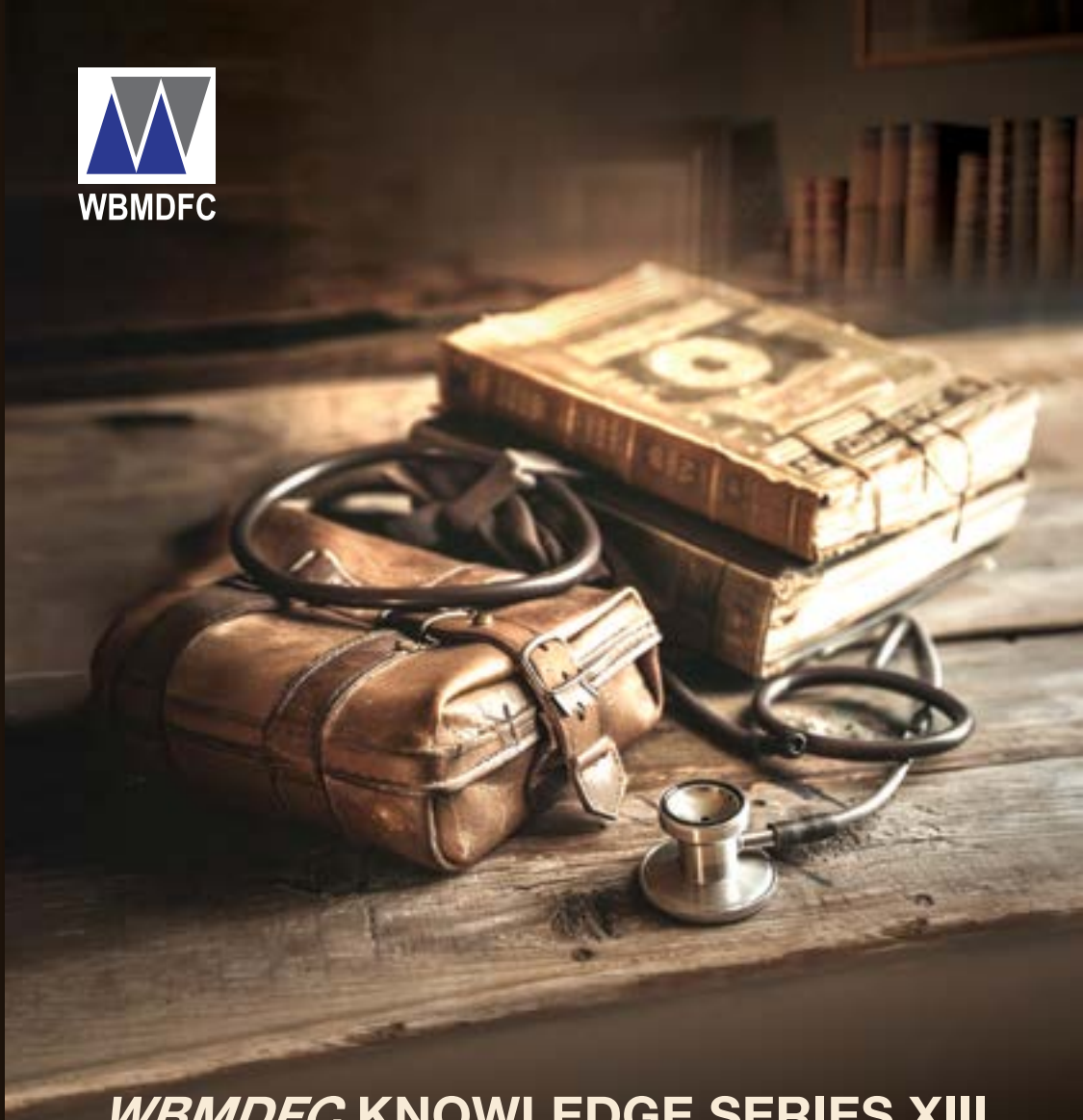

WBMDFC KNOWLEDGE SERIES XIII

ডঃ খানবাহাদুর তামিজউদ্দিন খান

(১৮২৬–১৮৮২)

Dr. Khan Bahadur Tamizuddin Khan

ডাক্তার খানবাহাদুর তামিজউদ্দিন খাঁন

(১৮২৬-১৮৮২)

লেখক

ডঃ সাবির আলি

মুল্যায়ন ও প্রমাণীকৃত

ডঃ সাফুরা রাজেক

Dr. Khan Bahadur Tamizuddin Khan

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব, জানুয়ারী, ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

Printed at Saraswaty Press Limited

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ড. পি. বি. সেলিম
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ডাক্তার খানবাহাদুর তামিজউদ্দিন খাঁ সম্পর্কৃত এই পুস্তকটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করবে।

শাকিল আহমেদ, আই.এ.এস
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ডাক্তার খানবাহাদুর তামিজউদ্দিন খাঁন

(১৮২৬-১৮৮২)

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার অন্যতম সফল বাঙালি ডাক্তার ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে তামিজ খাঁনের নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কার্যকলাপ চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চাকারী ঐতিহাসিকদের লেখাতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় উনিশ ও বিশ শতকে যে সকল চিকিৎসকদের নাম সচরাচর উঠে আসে তারা হলেন ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, মহেন্দ্রলাল সরকার, কেদারনাথ সরকার, নীলরতন সরকার ইত্যাদি। একথা মনে রাখতে হবে যে, ১৮৩৫ সালে ভারতে প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষাকেন্দ্র অর্থাৎ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য ধাঁচে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গবেষণার দ্বার খুলে গিয়েছিল। আর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের পরই বহু বাঙালি চিকিৎসক ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে ও গবেষণার মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজেদের অবদান রেখে গেছেন। অথচ এই একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তামিজ খান শিক্ষা গ্রহণের পর ব্যক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে ইতিহাসে যথেষ্ঠ অবদান রাখলেও তাঁর নাম সমকালীন ইতিহাসে অমিল। সম্ভবত এর কারণ হতে পারে সমকালীন সরকারি রক্ষণাগারে সংরক্ষিত কাগজের অভাব।

তামিজ খানের সম্পর্কে আমরা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পেয়ে থাকি তাঁর কাছের বন্ধু কানাইলাল দে সম্পাদিত Calcutta Medical Speach প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে। এই প্রবন্ধে কানাইলাল দে উল্লেখ করেছেন যে তামিজ খাঁন মারা গিয়েছিলেন ১৮৮২ সালে। দে তাঁর স্মৃতিচারণে তামিজ খানের ব্যক্তিগত জীবন ও

কর্মজীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কানাইলাল দে তামিজ খাঁনকে 'One of the Most Brilliant Medicine Men' বলে উল্লেখ করেছেন। সে আরও বলেছেন, "A Man of vast reading and very valuable professional knowledge, he was simple and unassuming as a child" ডাঃ কানাইলাল দের বক্তব্য থেকে আমরা তামিজ খাঁন এর কর্মজীবন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতেই পারি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তামিজ খাঁনের জীবন সম্পর্কে সমৃদ্ধপূর্ণ বিশেষ তথ্য আমাদের চোখে পরে না। ১৮৮৪ সালের The Bengal Directory তে উল্লেখ আছে যে ডাঃ তামিজ খাঁন থাকতেন মধ্য কলকাতার মলঙ্গা লেনের ৩২ নম্বর বাড়িতে। কানাইলাল দে জানিয়েছেন যে, তামিজ খাঁনের জন্ম হয়েছিল একটি সজ্জন পরিবারে। তবে বাল্যকালে তিনি কলকাতা সন্নিহিত কোনো এক অঞ্চলে বড় হয়েছিলেন। ডাঃ কানাইলাল দের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি প্রতিদিন কলকাতার কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন। কলকাতার তালতলাতে অবস্থিত কলিঙ্গা স্কুল। এর পুরো নাম কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল। এটি ঠিক তালতলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর নাম অনুসারে বর্তমানে কলিন্স স্ট্রাটের নামকরণ হয়েছে। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হবার পর (১৭৮১ সালে) এই মাদ্রাসাতে কলকাতার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেদের জন্য প্রবেশাধিকার ছিল, দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা এখানে পড়বার সুযোগ পেত না। তাই মাদ্রাসার পরিচালনাতেই গড়ে উঠল আলাদাভাবে আরও একটি স্কুল ঠিক তালতলাতেই মাদ্রাসার অঙ্গণে। নাম দেওয়া হয় কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুল। দরিদ্র ছেলেরা এই স্কুলে ভর্তি হতে পারত। এমনই একজন মুসলিম ছেলে এই কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। এই উজ্জল মেধাবি ছেলেটি স্কুলে ভালো পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে সকলের নজর কেড়ে নিলেন অচিরেই।

তামিজ খাঁনের জন্ম তারিখ বা সাল নিয়ে আমাদের কাছে বিশেষ তথ্য বর্তমানে নেই। তামিজ খাঁনের জন্মসময় ঠিক কখন সেই নিয়ে সরকারি কাগজপত্রেও সেরকম সঠিকভাবে তথ্য পাওয়া

যায়নি। তবে পরবর্তীকালে সরকারি যে সকল নির্দেশাবলী আছে সেগুলি দেখলে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে তিনি ১৮২৬ সাল নাগাদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কারণ General Report on Public Instruction, the Bengal Presidency, 1846-47 এর List of Students for Final Examination on the Medical College (1846-47) এর তালিকায় তামিজ খাঁনের নামের পাশে বয়স লেখা ছিল ২১ বছর। তাই এই সরকারি রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা তাঁর জন্মসাল ১৮২৬ বলতে পারি। প্রজিত বিহারি মুখার্জীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তিনি মুন্সি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে তিনি পরবর্তী জীবনে নামের আগে মুন্সি কথাটি ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি যে উনিশ শতকের শুরু থেকে 'মুন্সি' পদবীটি বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হত। মুঘল শাসনকালের প্রথম দিকে 'মুন্সি' পদবীটি কেবলমাত্র ইরানের উচ্চবংশজাত পরিবারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত।" কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু হিন্দু বাক্তিত্ব মুন্সি পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন, বিশেষকরে আকবরের সময় থেকে এর ব্যবহার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। আকবরের সময়কালে এই হিন্দু মুন্সিদের উদারভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। হিন্দু সমাজে তাদের ধর্মীয় উদারতার জন্য মুঘল সমাজে তাদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হত।" অন্যান্য মুসলিম পরিবারের মতো তামিজ খাঁন ও বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ফার্সি, বাংলা এবং সম্ভবত সংস্কৃত ভাষাতে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তিনি ইংরাজি ভাষায় কোন শিক্ষাগ্রহণ করেননি। বাঙালি চিকিৎসক সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন যে, ১৩ বছর পর্যন্ত তামিজ খাঁন ইংরাজি ভাষাটাই শোনেননি।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও তামিজ খাঁনের পাশ্চাত্য মেডিক্যাল শিক্ষা:

কলিঙ্গা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরে তামিজ খাঁ অবশ্য মনোস্থির করেছিলেন যে তিনি কলকাতায় একটি ওষুধের দোকানে কাজ করবেন। কিন্তু ওষুধের দোকান খোলার জন্য প্রথমে তাঁর নিজের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন ছিল। তবে তার এই ইচ্ছা খুব শিঘ্রই পূরণ হল। কিছুদিনের জন্য তিনি

একটি কলকাতার ওষুধের দোকানে কাজ করতে শুরু করেন। তামিজ খাঁনের ওষুধের দোকানে কাজ করার ইচ্ছা দেখে আমরা তাঁর মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। কিছুদিন পর তিনি আরও বড় চাকরি পেলেন। তিনি একটি সরকারি মেডিক্যাল স্টোরে কাজ করার সুযোগ পেলেন। সেখানে তিনি কম্পাউন্ডার পদে যোগদান করেন। সেই সময় ওই সরকারি ওষুধের দোকানের তদারকি পদে কর্মরত ছিলেন ডঃ গ্রান্ট। তিনি ছোট্ট তামিজ খাঁনের উৎসাহ ও বুদ্ধি দুই দেখে খুব খুশি হন। তিনি তামিজ খাঁনের সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে ছোট্ট তামিজ খাঁনের মেডিক্যাল শিক্ষাতে বিশেষ আগ্রহ আছে। ডঃ গ্রান্ট তামিজ খাঁনকে কিছু প্রাথমিক প্রশ্ন করে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন ছেলেটি ডাক্তারী পড়বার জন্য উপযুক্ত। ডঃ গ্রান্ট তৎক্ষণাৎ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ এফ. জে. মৌয়াটকে একটি সুপারিশ চিঠি লেখেন এবং তামিজ খাঁনের বিষয়ে জানান। তামিজ খাঁন সেই সুপারিশ পত্রটি নিয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ এফ. জে. মৌয়াট-এর কাছে পৌছান। ডঃ এফ. জে. মৌয়াট তামিজ খাঁনকে কতগুলো সাধারণ প্রশ্ন করে খুব খুশি হন। তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন খুব শীঘ্রই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইংরাজি ক্লাসে ভর্তি হন। সম্ভবত ১৮-৪২-৪৩ সাল তামিজ খাঁন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজি বিভাগে ভর্তি হন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক তাঁর স্মৃতিকথায় জানান যে, "By diligence and perseverance, the young Tamiz mastered the difficult science of medicine and acquired a mastery over the English language"

প্রতিষ্ঠাপরবর্তী সময় থেকেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজি বিভাগে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। তবে ১৮৩৯ পরবর্তী সময়ে দেশে চিকিৎসকের অভাব মেটানোর জন্য যখন মেডিক্যাল কলেজের তত্ত্বাবধানে সেকেন্ডারি বিভাগ খোলা হয় এবং সেখানে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দুস্থানি ভাষাকে ব্যবহার করা হয় সেখানে চিত্রটা ছিল অন্য অর্থাৎ সেখানে মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যা অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল। ১৮৪৩

সালে মেডিক্যাল কলেজের এক রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৮৪৩ সালে মেডিক্যাল কলেজের মোট ছাত্রের সংখ্যা ৬৯ যার মধ্যে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ জন। ঠিক এই রকম এক পরিস্থিতে তামিজ খাঁন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিনের মধ্যেই তামিজ খাঁ মেডিক্যাল কলেজে নিজের ক্লাসে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমনকি তাঁর শিক্ষক ডঃ এলান ওয়েবকে শিক্ষকতা কাজে তিনি সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন। ডঃ ওয়েব পরবর্তীকালে লিখেছিলেন (GPIC, 1845-46, p. 124) I have received great assistance from Tameez Khan in the instruction of this class... the value of an intelligent assistant, speaking both English and Urdu, is very obvious, and Tameez Khan has commonly taken one half of the class, whilst I have kept the other employed. ১৮৪৬ সালে প্রথমবর্ষের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এমনকি প্রথম দিনের প্র্যাকটিক্যাল এনাটমি পরীক্ষায় পরীক্ষকের সামনে তাকে মৃতদেহের কোন একটি অংশ ব্যবচ্ছেদ করে দেখাতে হয়েছিল সেই বিভাগেও তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পান এবং তিনি স্বর্ণপদক অর্জন করেন এবং সেই জন্য তিনি লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জের কাছ থেকে দুশো টাকা এবং ডাঃ জ্যাকসনের কাছ থেকে একশো টাকা পুরস্কারও পান।

তামিজ খাঁন মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত অবস্থায় কোর্সের অঙ্গ হিসাবে অন্যান্য ছাত্রদের মতন মৃতদেহের চ্ছেদ করতেন শারীরবিজ্ঞানে জ্ঞানলাভের জন্য, তবে তামিজ খাঁন এক্ষেত্রে যে বিশেষ ছাপ রেখেছিলেন, তা হল মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে রোগ নির্ণয় করা ও রোগের স্বরূপ নির্ণয় করা। শুধু তাই নয় তামিজ খাঁন এই সমস্ত রোগে মৃত্যু হওয়া মানুষগুলির রোগাগ্রস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি সংরক্ষণ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি মিউজিয়ামের সংগ্রহশালায় দান করতেন, কারণ ভবিষ্যতের ডাক্তারী ছাত্ররা যাতে তা থেকে রোগের স্বরূপগুলো নিখুঁতভাবে উদ্ঘাটন করতে পারেন। এর সাথে তামিজ খাঁন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি রোগীর কেস হিস্ট্রি লিখতেন। কোন রোগীর চিকিৎসা যা

যা করা হচ্ছে তা হিস্ট্রি সিটে বাঁ দিকে সবিস্তারে লিখতেন এবং তাঁর শিক্ষকদের দেখিয়ে নিতেন। তার এই কাজের জন্য তার শিক্ষক ডঃ ওয়েব সমূহ প্রশংসাও করেছেন। তামিজ খাঁন যতদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়েছেন ততদিনই সে ক্লাসের পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। প্রসূতিবিদ্যা পরীক্ষায় সে সময় যে প্রথম হত তাকে গুডিভ বৃত্তি দেওয়া হত। ১৮৪৬ সালে তামিজ খাঁন প্রসূতিবিদ্যার পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় সেই বছর তাঁকে ডঃ হেনরি হ্যারি গুডিভ নিজ হাতে গুডিভ বৃত্তি পুরস্কারটি দেন।

কর্মজীবনে তামিজ খান:

মেডিক্যাল কলেজে গ্রেজুয়েট হবার পর ডাঃ তামিজ খাঁন প্রথমে সাব অ্যাসিটেন্ট সার্জেন পদে যোগ দিয়ে চলে যান কুমায়ুনে এবং সেখান থেকে কিছুদিন পরে লাহোরে। লর্ড হার্ডিং ১৮৪৫-১৮৪৬ সালে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখ সাম্রাজ্যকে পুরোপুরিভাবে পরাজিত করেন এবং সেই দশকের শেষে শিখ সাম্রাজ্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সেই সময় তামিজ খাঁন মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তের রাজধানী লাহোরে কর্মরত ছিলেন। তামিজ খাঁন চেয়েছিলেন যে লাহোরে আরও অধিক পরিমাণে বিনামূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ইউরোপীয় মেডিসিনকে শিখ সম্প্রদায়ের কাছে প্রচলিত করা ও তাদের জনসমাজে তা জনপ্রিয় করা। আসলে তিনি অনুভব করেছিলেন যে শিখ সাম্রাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে তা প্রচলন ঘটলে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে। তামিজ খাঁন লাহোরে থাকাকালীন মেডিসিন সম্পর্কে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই রকমই একটি গবেষণাপত্রের নাম হল Bedmushk: On the 'Bed Mooshk' Plant of Lahore। পাঁচ পাতার এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল বেদমুখ উদ্ভিদটির ঔষধীয় গুণাগুন ও ব্যবহার।

কলকাতা থেকে তামিজ খাঁন লাহোরে চলে যাবার পর তাঁর জায়গায় মেডিক্যাল কলেজে হাউস সার্জেন পদে নেওয়া হয় ডাঃ শশীভূষণ শীলকে। কিন্তু অধ্যাপক ডাঃ স্টুয়ার্ট এতে একবারে

খুশি হননি। তাই ১৮৫২ সালে ডাঃ স্টুয়ার্ট-এর অনুরোধে লাহোরে দীর্ঘদিন থাকার পর তামিজ খাঁন কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের হাউস ফিজিসিয়ান হিসেবে যোগদান করেন। মধুসুধন গুপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার এ্যানাটমি বিভাগে শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু ১৮৫৬ সালের ১৫ নভেম্বরে তাঁর মৃত্যুর পর এই পদটি ফাঁকা থাকে এবং তামিজ খাঁনকে ওই পদে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়। তবে খুব শীঘ্রই ১৮৫৬ সালে ডঃ শিবচরণ কর্মকার অসুস্থ হওয়ার কারণে তামিজ খাঁনকে তাঁর মেট্রিয়া মেডিকা ক্লাসের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। এরপরে প্রসন্নকুমার মিত্রের মৃত্যু হওয়ার পর তামিজ খাঁনকে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান পদের জন্য মনোনিত করা হয়। পরে যখন দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ মেডিক্যাল কলেজ থেকে আলাদা করা হয়েছিল, তখন তাঁকে শিয়ালদার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম ফিজিসিয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়।

মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্পর্কে ডাঃ তামিজ খাঁনের অভিমত:

কিছুদিনের মধ্যেই তামিজ খাঁন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গোষ্ঠির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্বশীল ও কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও তিনি নিজেকে একজন দক্ষ চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে তিনি New Sydenham Society-র নিয়মিত সদস্যপদ গ্রহণ করেন। পরে তিনি লন্ডনের Epidemiology Society এবং Australian Medical Journal এর সাথে যুক্ত হন। কলকাতায় থাকাকালীন কনসেন্ট বিল অর্থাৎ মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স পাশ করা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। এই বিলের প্রধান অংশ ছিল মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স নির্ধারন করা। এই বিষয়টি নির্ধারন করার উদ্দেশ্যে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয়। সেই উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তামিজ খাঁন। তিনি মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্পর্কে সর্বপ্রথম মত জ্ঞাপন করেন।

১৮৭১ সালের ১ এপ্রিল ভারত সংস্কার সভার পক্ষ থেকে কেশবচন্দ্র সেন মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসকদের অভিমত জানতে চান। এই মতপ্রদানকারীদের মধ্যে তামিজ খাঁ হলেন অন্যতম। তামিজ খাঁন বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমের প্রভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। তারই ফলে ভিন্ন আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় বসবাসকারী একই বয়সের মেয়েদের তুলনায় ভারতীয় মেয়েদের যৌবন শীঘ্রই শুরু হয়। সমাজের জীবনধারার অভ্যাস বয়সকে প্রভাবান্বিত করে। বিলাসবহুল আবহাওয়ায় যে মেয়েদের জন্ম ও লালন-পালন হয় তাদের যৌবন প্রতিকূল আবহাওয়ায় জন্ম ও লালিত-পালিত হওয়া সমবয়স্ক মেয়েদের তুলনায় অতি শীঘ্রই শুরু হয়। সেই বয়সের একটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত বলে গণ্য হলেও, অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান ও জীব জগতের নিয়ম অনুসারে অতি অল্প বয়সের মেয়েটি স্ত্রীর কর্তব্য ও মায়ের ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না। এই অবস্থায় উক্ত কাজের জন্য তার উপরে বলপ্রয়োগ করা হলে শীঘ্র তার স্বাস্থ্য ও উদ্যম ভেঙে পড়বে এবং বৃদ্ধত্ব ও জরাজীর্ণ অবস্থায় সে উপস্থিত হবে। এর ফলে পরবর্তী বংশধরদের উপরেও খারাপ প্রভাব পড়বে। বৈজ্ঞানিক ও মনুষ্যচিত দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হওয়া উচিত নয়। কমপক্ষে ১৬ বছরকেই একটি মেয়ের বিবাহযোগ্য বয়স বলে ধরা উচিত। যদি আরও বেশি বয়সে বিবাহ হয় তাহলে ব্যক্তি ও বংশধরদের উন্নতি হবে।

তবে শুধু তামিজ খাঁন নয়, ভারত সংস্কার সভার সভাপতি কেশবচন্দ্র সেন আরও ১১ জন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চান মেয়েদের বিবাহের নূন্যতম বয়স কত হওয়া উচিত। এই চিকিৎসকরা মেয়েদের বিবাহের নূন্যতম বয়স যা অনুমোদন করেছিলেন তা হল - মহেন্দ্রলাল সরকার ১৬ বছর, সিভার্স ১৬ বছর, স্মিথ ১৬ বছর, এওয়ার্ট ১৬ বছর, ফেরার ১৬ বছর, সূর্যকুমার গুড়িভ চক্রবর্তী ১৬ বছর, আত্মারাম পান্ডুরাঙ ২০ বছর, চন্দ্রকুমার দে ১৪ বছর, চলর্স ১৪ বছর, নবীনকৃষ্ণ বসু ১৫ বছর, হোয়াইট ১৫/১৬ বছর।

তবে তামিজ খাঁন বিবাহযোগ্য বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে রীতিমত যে গবেষণা করেছেন তা কেশবচন্দ্র সেনকে লেখা তাঁর চিঠিতে প্রমাণিত। এই পত্রটি পরে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ সালে Calcutta Journal of Medicineএ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন-

Experience and the laws both tend to establish the fact that in the tropical climates, the age attained between the tenth and the thirteen year. Although a girl may become marriageable at the age, but dictates of observation, common sense and lastly biological laws cannot but lead us to the conclusion that a female cannot be sufficiently mature for the fulfillment of the serious duties of a wife much less for those of a mother, at the extremely tender and early age; and that where forced to do so, her delicate and hitherto immature organization becomes rapidly inspired both in health and vigour and thus before she is actually young, she gets old and decrepit. This exerts its baneful influence on her progeny. Speaking in a scientific and human point of view, I might safely pronounce that in considering the proper age of marriage for the native girl of India, we should not look to the time when the signs of puberty show themselves generally, but make it a point that under no circumstances is a girl to be allowed to get married before she has attained the full age of sixteen years at least. (The Calcutta Journal of Medicine, 1871, p. 269)

ডাঃ তামিজ খাঁন ও বাংলায় মেডিক্যাল টারমিনোওলজি অনুবাদের সমাধানসূত্র:

তামিজ খাঁন তৎকালীন বহু সরকারি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যা তাঁকে পরবর্তীকালে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির অনুবাদের কাজে তাঁর অবদান। ১৮৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাংলা শ্রেণি যাত্রা শুরু হয়। ওই শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বাংলা বইয়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাংলা বইয়ের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠে। 'সংবাদ প্রভাকরে' বলা হয়:

অবগত হইল মিডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্য্য একপ্রকার নির্ব্বাহ হইতেছে, ফলে তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না, যেহেতু শিক্ষাবিষয়ক পুস্তকাদি অদ্যাপি কিছুই হয় না। এক লেকচারের উপর নির্ভরের করিয়া ছাত্ররা কি করতে পারে? তাহার দিগের পাঠ্যপুস্তক না হইলে কোনমতেই সুফল দর্শিবেক না। এ বিষয়ে আমরা এডুকেশন কাউন্সিলকে অনুরোধ করি, ত্বরায় বিহিত মনোযোগপূর্ব্বক মিডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর ছত্রদিগের দুরবস্তার উচ্ছেদ করুন।

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোনও পাঠ্যবই না থাকায় ছাত্রদের ক্লাসে ও কর্মক্ষেত্রে নোটের উপর নির্ভর করতে হয়। কখনও-কখনও ভালো নোটের মালিকরা এই সুযোগে তাঁদের নোটের দৌলতে বেশকিছু রোজগারও করে নিত। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় হাকিম, কবিরাজ, প্রভৃতি দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ হবে দেশীয় ভাষায় অনূদিত অথবা প্রকাশিত বইয়ের পর্যালোচনা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বইয়ের প্রয়োজনীয়তা স্থির করা।

এই অবস্থায় শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে এক বক্তব্য পেশ করা হয়। তৎকালীন প্রকাশিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইয়ে খুশিমত বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহারে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা উল্লেখ করে চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় বই প্রকাশের জন্য সমভাবে প্রতিশব্দ স্থির করতে চিকিৎসক ও মাতৃভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৮৭১ সালে বাংলার লেফট্যানান্ট গভর্নর এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করার জন্য ডব্লিউ. এস. অ্যাটকিন্‌সন, ডঃ এন. সিবর, ডঃ জে. এওয়ার্ট, ডঃ এস. জি. চক্রবর্তী, ডঃ বি. বি. স্মিথ, খানবাহাদুর মৌলবি তামিজ খাঁ এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন।

বাংলাভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৭১ সালে সরকার যে কমিটি গঠন করেন, খানবাহাদুর মৌলবি তামিজ খাঁন তাতে মতপ্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। পরিভাষা সম্পর্কে সেই কমিটির কাছে

তিনি নিম্নলিখিত স্মারকলিপি পেশ করেন:

(ক) চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষাকে সংশোধন করতে হলে প্রাচীন চিকিৎসকদের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবি শব্দগুলি প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে যা বিস্মৃত হয়েছে, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

(খ) সমস্ত আরবি ও সংস্কৃত শব্দগুলির প্রকৃত প্রত্যয় নির্ণয়ের অনুকূলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেন : ১। কোনো শব্দবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক ভাষায়, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হলে তা অনুবাদ করতে হবে। ২। কোনোও দুষ্প্রাপ্য শব্দ সাধারণ ভাষায় ব্যবহার না হলে তার আরবি ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে। আরবি অথবা সংস্কৃত প্রতিশব্দ না পাওয়া গেলে ইংরাজি শব্দকে অক্ষরান্তরিক করে ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইংরাজি বইকে উর্দু অথবা বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বাস্তব বা আপাত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিকারে তিনি নিম্নলিখিত পথগুলি সুপারিশ করেন:

তিনি মনে করেন অনুবাদের মূল সমস্যা হল মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির প্রতিশব্দ খুঁজে বার করা। উর্দু ও বাংলায় পাঠদানের সময় তিনি ওই সমস্যার সম্মুখীন হন এবং তামিজ খাঁ পরিভাষার সমস্যাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

প্রথম ভাগ : চিরপরিচিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি এই শ্রেণির অন্তর্গত। উর্দু ও বাংলায় এর প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় : হৃদপিন্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগ : চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমন অনেক শব্দ আছে, মাতৃভাষায় যার কোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় ভাগ : ইংরাজি চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, মাতৃভাষায় অনুবাদের সময় যার কোনোও বাস্তব অথবা আপাত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ শব্দই হল এই শ্রেণির অন্তর্গত।

ওই শব্দগুলি সমাধানের জন্য তিনি কিছু সুপারিশ করেন। যথা - (i) ইংরাজিতে লিখিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনোও বইকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে হলে আগেই দেখতে হবে ইউরোপীয় পরিভাষাগুলির কীভাবে সমাধান করা যায়। মাতৃভাষায় কি

এগুলির কোনোও প্রতিশব্দ পাওয়া যায়? এগুলি কি মৌলিক অথবা নতুন? যে সব শব্দের মাতৃভাষায় প্রতিশব্দ পাওয়া যায় সেই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে ওই সব প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে বিষয় অথবা প্রবন্ধ অনুযায়ী আলোচনা করার আগে শিরোনামে ইংরাজি অক্ষরে মূল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে হবে। (ii) ভারতীয় ভাষাগুলি প্রধানত সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি থেকে উদ্ভূত। এই সকল ভাষায় বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়েছে। অবজ্ঞাপ্রসূত সেই সমস্ত বইয়ের বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নয়। সেই জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দগুলি খুঁজে বার করা অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হয়। একই কারণে মাতৃভাষায় প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও অনেক অনুবাদক নতুন প্রতিশব্দ তৈরি করতে বাধ্য হন। এইভাবেই চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।”

নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তামিজ খাঁন বলেন, আগে মাতৃভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইগুলি নিয়ে আলোচনা করায় তাঁর ভুলগুলি দূর হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইংরাজি বইতে যে সমস্ত শব্দ পাওয়া যায়, মাতৃভাষায় এর প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভালো করে খুঁজলে দেখা যায় ফার্সিতে জুল গুরেন নামে প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যার প্রকৃত অর্থ ‘যুগ্ম-স্পন্দন’। এই বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেন, শুধু চিকিৎসকদের দ্বারা কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই অনুবাদ করলে তা সম্পূর্ণ ঠিক হবে তা নয়। মাতৃভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই সম্পর্কে অনুবাদের ধারণা থাকা চাই। তাহলেই তিনি অনুবাদ করতে পারবেন। অপর দিকে মাতৃভাষায় সামান্য জ্ঞানসহ কোনো চিকিৎসক যদি মৌলবি অথবা পন্ডিতের সাহায্যে ইংরাজিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির মাতৃভাষায় প্রকাশিত প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে চান তিনি সঠিকভাবে তা বের করতে পারবেন না। তাই অনুবাদকের প্রথম কাজ হবে মাতৃভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই থেকে বৈজ্ঞানিক

শব্দগুলি সংগ্রহ করা। পরবর্তী পর্যায়ে ইংরাজি প্রতিশব্দের সাথে একে তুলনামূলকভাবে বিচার করা। এই প্রক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হলেই একমাত্র বিজ্ঞান বইয়ের অনুবাদ করা সম্ভব।

তিনি নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ওই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করলে অনেক দেশীয় পরিভাষা পাওয়া যাবে। এর জন্য মাতৃভাষার সঙ্গে বহুল পরিচিত এমন একজন চিকিৎসক, একজন উপযুক্ত মৌলবি এবং একজন পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি একটি কমিটি করার সুপারিশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ওই কাজ করা সম্ভব নয়। এর জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি ব্যবহার করতে তিনি সুপারিশ করেন:

1. "Buhrool Juwahr", a *Medical Dictionary* by Hakeem Mahammad Bin Yousoof, ed., by Hakeem Abdool Majeed.
2. Dr. Tytler's Glossary in "Unees-ool-Moosh-Shurraheen.
3. Maulavie Hakeem Abdul Majeed's edition of Chughmeenee's "*Quanoocha*."
4. Dr. Breton's *Medical Vocabulary*.
5. Dr. F.G. Gladwin's *Vocabulary*.
6. Mr. Dacosta's Contributions in Dr. Corbyn's *Medical Journals*.
7. Rev. Dr. Carey's Translation of *Anatomy*.
8. Baboo Khetter Mohon Dutta's *Principal of Medicine*.
9. *Hudood-ool-Amruz*.
10. *Affauz'ool-Udweeah.*
11. *Reauz'ool-Udweeah.*
12. *Meeaur'ool-Amrauz.*

তৃতীয় পর্যায়ে এমন সমস্ত পরিভাষার কথা তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে মাতৃভাষায় যার কোনো দুইভাবে প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। সংখ্যার দিক দিয়ে এগুলি তুচ্ছ নয়। তামিজ খাঁ বলেন, দুইভাবে ওই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব : ১। মাতৃভাষায় মূল শব্দটিকে অক্ষরান্তরিত করে ব্যবহার করা। অথবা ২। এর গুরুত্ব বোধগম্য করার জন্য মাতৃভাষায় নতুন শব্দের ব্যবহার করা। উভয় পদ্ধতিকে সমর্থন করার মতো যুক্তি থাকলেও তিনি মনে

করেন সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সিতে এগুলির অর্থবহ কোনোও শব্দ পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে ইংরাজি, ল্যাতিন, অথবা গ্রিক শব্দটিকে হুবহু ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

অন্যান্য সামাজিক কর্ম ও তামিজ খান:

ডাঃ তামিজ খাঁন শুধু সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত থেকে খান্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি সেই সময় ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মের মাধ্যমে যুক্ত থেকে সমাজের মানুষকে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে একটি অন্যতম হল গর্ভাবতী মহিলাদের আনরস খাওয়াতে নিষেধাজ্ঞা। সে সময়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল যে, গর্ভাবতী মহিলা, এমনকি গর্ভাবতী গাভীকেও যদি প্রচুর পরিমাণে আনারস খাওয়ানো হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে গর্ভাপাত ঘটানো সম্ভব। এই কুসংস্কার ভাঙতে আসরে নেমেছিলেন তামিজ খাঁন। তিনি সাধারণ মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার জন্য গর্ভাবতী গাভী এবং ছাগল কে প্রচুর আনারস খাইয়ে নিবিরভাবে পরীক্ষা করে ঘোষণা করেন যে এই ভ্রান্ত ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যদিও তাঁর এই পরীক্ষার কথা আমরা পরে জানতে পারি ১৮৭০ সালে ডাঃ সিভার্সের লেখা A Manual of Medical Jurisprudence for India থেকে। এছাড়া তামিজ খাঁনের কসাইখানার স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও তাঁর যে বক্তব্য তা আমরা ১৮৭১ সালের পেশ করা কলকাতার কমিশনার্সের তরফে জানতে পারি।

দুঃখের বিষয় যে সরকারি কোন নথিতে ডাঃ তামিজ খাঁনের কোন ছবির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যতদূত জানা যায় যে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে থাকাকালিন তাঁর ছাত্রদের অনুরোধে একটি তৈলচিত্রের অঙ্কণ করা হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের লাইব্রেরি বা গুদাম ঘরে তার কোন সন্ধান বর্তমানে নেই।

তামিজ খান ও ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজ:

তামিজ খান পরবর্তী সময়ে সবথেকে বেশি পরিচিতি পেয়েছিলেন

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত অবস্থায়। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অত্যধীক রোগীর চাপ কমানোর জন্য ১৮৬৭ সালে সরকার একটি নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলেন। ১৮৭৩ সালের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রিপোর্ট থেকে জানতে পারি যে সেখানের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪০০ হয়েছে। এই কারণে মেডিক্যাল কলেজে বাংলা বিভাগকে অন্যত্র সরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং ১৮৭৩ সালে এই হাসপাতালের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজও স্থাপিত করা হয়। সেখানেই মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগকে স্থানান্তর করা হয়। তৎকালীন গভর্নরের ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে এই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় বলে ১৮৭৪ সালে এই মেডিক্যাল কলেজের নাম রাখা হয় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল। শিক্ষক হিসাবে মেডিসিন বিভাগে এখানে নিযুক্ত করা হয় তামিজ খাঁনকে, প্রসূতিবিদ্যা বিভাগে মীর আসরফ আলীকে, শল্যবিদ্যা বিভাগে রামনারায়ণ দাসকে এবং রসায়ন বিভাগে কানাইলাল দে কে।

তামিজ খাঁন এই কলেজ কে নিজের কর্মক্ষেত্রের উর্দ্ধে ভাবতেন। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ক্রমে ক্রমে তামিজ খাঁনের প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠে। এই স্কুলের প্যাথলজিক্যাল মিউজিয়ামটি তামিজ খাঁনের অন্যতম সৃষ্টি। এর আগে এই ধরনের মেডিক্যাল মিউজিয়াম তৈরী নজিরবিহীন। সমগ্রজীবনে তিলে তিলে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সংগ্রহের মাধ্যমে এই মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ।

তামিজ খাঁন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। ডঃ দুর্গা করের পুত্র ডঃ রাধাগোবিন্দ কর, যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করার উৎসাহ তাঁর বাবার কাছ থেকে পাননি, তিনি তাঁর গ্রন্থটি রচনা করার উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয়

দুই শিক্ষক ডঃ কানাইলাল দে ও ডঃ তামিজ খাঁনের কাছ থেকে। তামিজ খাঁনের মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তাঁর ছাত্ররা ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে নিজেদের মধ্য থেকে চাঁদা তুলে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করেছিলেন। তামিজ খাঁন তার সমগ্র জীবনে বহু পুরস্কারে ও সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি অন্যতম হল 'খানবাহাদুর'। ১৮৬৯ সালের ৭ জানুয়ারিতে ব্রিটিশ সরকার তামিজ খাঁনকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এর সাথে ১৮৭৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যও নির্বাচিত হন।

তিনি কলকাতা মেডিক্যাল সোসাইটির অ্যানাটিমিক্যল ও প্যাথোলোজিকাল বিভাগের অংশগ্রহণকারী সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ন্যাশানাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আবার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক এটওয়ালের বিশেষ অনুরোধে ইউনানি ঔষধ সম্পর্কে দিল্লির মহম্মদ মীর্জা একটি স্মারকলিপি দাখিল করেন। অধ্যাপক তামিজ খাঁন তা অনুবাদ করে দেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন সুশ্রুতের আরবি অনুবাদ হল 'কিতাব-শুশ্রুদ-আল হিন্দ'। ডঃ আইন্সলির লেখা মেটিরিয়া মেডিকার দ্বিতীয় খন্ডে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কানাইলালের মতে, তামিজ খাঁন পড়ানোর ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে সবর্দা শিক্ষণসহায়ক উপকরণ বা Teaching Aid ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে কানাইলাল দে যখন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে পুরানো ওষুধ সংরক্ষণের জন্য একটি মিউজিয়াম প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তামিজ খাঁ অ্যানাটমি ও পাথোলজি সামগ্রী সংগ্রহের প্রধান সংগ্রাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

তামিজ খাঁন মারা যায় ১৮৮২ সালের জুন মাসে। প্রায় দীর্ঘ দু-মাস ব্যাপী জ্বরে ভোগার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অসুস্থতার সময় চিকিৎসা করেছিলেন তাঁর অনুগত ছাত্র ডঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ও কানাইলাল দে। তামিজ খাঁ একজন অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষক ছিলেন, ফলে তাঁকে দেখে পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্ররা অনেক বেশি উৎসাহ পেয়েছিল। তামিজ খাঁন

পরবর্তীকালের বাঙালি ছাত্রদের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় আসার জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য ওষুধকে মানুষের ব্যবহারের জন্য ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সেতুবন্ধকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কানাইলাল দে ১৮৮২ সালের ১৪ জুন বুধবার এক শোকসভায় দুঃখ করে বলেছিলেন, "Though a man of a vast reading and very valuable professional knowledge, he was as simple and unassuming as a child; I need not say that the loss we mourn today will not be soon and easily repaired." তার মৃত্যুতে ডাঃ হার্ভেও অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক যোশেফ ফেরার এই শরণসভায় বলেন যে তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর খবর ১৮৮২ সালের ১৯ জুন বাংলার সাপ্তাহিক পত্রিকা সোমপ্রকাশেও প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি তাঁর কর্মজীবনে ছাত্রদের সর্বদা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সাধারণের মাধ্যে প্রয়োগের উপর জোড় দেওয়ার কথা বলতেন। কারণ তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, ভারতে দিনে দিনে ট্রপিক্যাল ডিসিস্ এর পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এই ধরনের রোগের প্রতিকারের জন্য আমাদের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি যথাযত নাও হতে পারে, ফলে দিনে দিনে মানুষের মৃত্যুর পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর প্রতিকার হিসাবে সাধারণ জনগণকে এল্যাপথি চিকিৎসাকে বেশি ব্যবহার করার কথা বলতেন। তিনি সমগ্রজীবনে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যাকে শুধুমাত্র অর্থ উপাজনের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহার করেননি, তিনি এই চিকিৎসাপদ্ধতিকে সাধারণ সামাজে প্রচলন ও জনপ্রিয় করার কাজেও নিয়োজিত হয়েছিলেন। এরাই সেই ব্যক্তিত্ব যারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে পুঁথিগত বিদ্যা থেকে সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিস্তার ও প্রয়োগে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তামিজ খানকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে 'শুকতারা' বা Morning Star বলতেই পারি।

HELPLINE

1800 120 2130

VISIT US AT

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A statutory corporation of Govt. of West Bengal)

'Amber', DD-27/E, Salt Lake, Sector-1, Kolkata-700064